Vol. 42 | No. 2 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আনোয়ার পাশার রাইফেল রোটি আওরাত : সময়ের দায় ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

Volume	42
Issue	2
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আমিনুর রহমান সুলতান
Published online	February 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i2.1
Pages	5-25
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আনোয়ার পাশার রাইফেল রোটি আওরাত : সময়ের দায় ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

আমিনুর রহমান সুলতান*

কথাশিল্পী ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশা তাঁর 'রাইফেল রোটি আওরাত'[১] গ্রন্থে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিবেশের বর্ণনা প্রদান করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—

> একটা পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল বটে উনিশ শো সাত-চল্লিশের চোদ্দই আগস্ট। সেটা পাকিস্তানের রাজনৈতিক সত্তা, সেটা দেহ। রাষ্ট্রের প্রাণ হচ্ছে তার অর্থনীতি, এবং তার চিন্ময় সত্তার অভিব্যক্তি সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে। ঐখানেই ছিল গণ্ডগোল। হাজার মাইলের ব্যবধানে বিরাজিত দুটো অংশের মধ্যে একটা অর্থনীতি গ'ড়ে উঠলে তাতে একটা অংশের দ্বারা অন্য অংশের শোষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেই,—অর্থনীতির ক্ষেত্রে একাংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য অংশের উপর। মুসলিম লীগ প্রাণপণে সেই আর্থনীতিক প্রাধান্য দেশের পশ্চিমাংশে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল (পৃ. ৩)

অবশ্য আর্থনীতিক শোষণ ছাড়াও এ সময় তারা দুটি দেশের মধ্যে ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন, সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ববাংলার ওপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য বর্তাতে চাইলেন। দুই দেশের সংস্কৃতিকে এক করতে চাইলেন উর্দু ভাষার ভিত্তিতে। এই আর্থনীতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক পেষণ দুইই রাজনৈতিক কৌশলের অপর পীঠ। কিন্তু হাজার মাইলের ব্যবধানে বিরাজিত দুটো অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধন করা যে খুবই কঠিন এবং জটিল কাজ তা পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাস্তবতার নিরিখে বিচার না করে ধর্মীয় ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণেও উদ্যোগী হলেন। সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধনের প্রাথমিক পর্ব ভাষার উপরও প্রয়োগ করা হল। কিন্তু পরিণামে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর কিছুটা হলেও বোধোদয় ঘটে যে, পূর্ববাংলার

---

* গবেষক, ঢাকা

১. আনোয়ার পাশা, *রাইফেল রোটি আওরাত*, (দ্বিতীয় সংস্করণ) বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৩

জনমানব অধিকাংশ মুসলমান হলেও এরা বাঙালি, বাংলা তাদের মাতৃভাষা। তাই মাতৃভাষার মমত্ববোধে বাঙালিরা শহিদ হতেও দ্বিধা করে না।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিস্তার সম্ভব হয়নি বলেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। ইসলামি আদর্শ তথা দ্বি-জাতিতত্ত্বের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক ও আর্থনীতিকভাবে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ফায়দা লুটতে থাকেন। বাঙালিরাও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত করার পর চুপটি মেরে বসে থাকেনি। এরাও রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক শোষণ নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্তির অন্বিষ্টে একে একে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করে যা বাষট্টি, ছিষট্টি, উনসত্তর এবং পরিশেষে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পরিণতি লাভ করে।

বাঙালির জনসমাজের ভাঙন ও নির্মাণের ইতিহাস একাত্তরের নয় মাস। এ ভাঙনে স্বপ্ন ছিলো অন্বিষ্টে পৌছার। অবশ্য তার জন্যে যে চেতনা কাজ করেছিল তা ভাঙন থেকে নির্মাণের। বাঙালি সত্তা, জাতীয় জীবন চেতনার, ঐতিহ্যের ইতিহাসের ক্ষয় ১৯৪৭-এর পর থেকেই শুরু হয়েছিল। চূড়ান্ত পরিণতি নেমে আসে একাত্তরের ২৫ মার্চের কালো রাতের মধ্য দিয়ে। যদিও তৎকালীন পাকিস্তান সরকার প্রত্যাশা করেছিল বাঙালির বিপর্যয়ের, ক্ষয় প্রাপ্তির, কিন্তু বাঙালি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করে, প্রতিরোধ করে। তাই পরিণতি আসে বাঙালিসত্তার বিকাশ সাধনে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রার্থিত নিরাপদ আশ্রয়ে।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের রক্তক্ষয় ত্যাগ তিতিক্ষায় একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম, অধিকার অর্জনের স্বাভাবিকতা দেখা দেয়। তবে অধিকার অর্জনের স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করতে পারতো, যদি মধ্যবিত্তের পিছুটানের মতো বাঙালি সমাজের ছাত্র, কৃষক, কুলি, মজুর, সাধারণ মানুষ থাকতো দোলাচল মানসিকতায়। মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতিতে আত্মপ্রেরণার উপলব্ধি না জাগতো তাদের অন্তর্সত্তায়।

বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যদিও কেউ কেউ প্রগতিপন্থী রাজনীতিকে সামনে রেখে মুক্তির স্বাদ পেতে বিশ্বাসী তবুও কিসের বন্ধন যেনো তাদের আটকে রাখে একটা ঘেরাকলে। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সবসময়ই পিছুটানে হঠাৎ থমকে দাঁড়ান।

মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটেছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশেও তারা থেকেছেন নিষ্ক্রিয় অথচ ছাত্র, কৃষক, সাধারণ মানুষ, কুলি, মজুর আত্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণের মায়া না করে অন্বিষ্ট অর্জনের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। এসবের বিকৃত রূপ মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলোতে স্পষ্টত মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মধ্যবিত্তের দোলাচলতা থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁদের মাঝেও বিদ্যমান ছিল। ছিল বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, মোট কথা সকলশ্রেণীর। কেউ সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, কেউ বা মুক্তিযোদ্ধাদের অসময়ে আশ্রয় দিয়ে, কেউ বা লেখনি শক্তি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সন্দেহ নেই।

আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত'-এর অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীন, শওকত ওসমানের 'জাহান্নাম হইতে বিদায়'[২]-এর প্রৌঢ় শিক্ষক গাজী রহমান, শওকত আলীর 'যাত্রা'[৩]-এর অধ্যাপক রায়হান, রশীদ হায়দারের 'খাচায়'[৪]-এর অধ্যাপক তাহের-এদের প্রত্যেকের শ্রেণীচরিত্র মধ্যবিত্ত। এদের মাঝে কাজ করেছে মধ্যবিত্তের জীবন মানসিকতা, এদের কাছে স্ত্রী-পুত্র নিজের জীবনের জন্যে মায়া-ই হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে এরা যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ নিয়েছে এমন নয়। পাকিস্তান টিকে থাক এটাও কামনা করেনি। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি, স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন ছিল পরোক্ষে হলেও। আসলে এদের চরিত্রটাই যে এরকম কাঠামোর, নিরাপত্তায় সীমায়িত, মূল্যবোধ সম্পর্কে সজাগ এই শ্রেণীটিকে সনাতনী কাঠামো ব্যবস্থাকে সহজে ভাঙতে পারে না। ভাঙতে পারে না বলেই শিল্পসত্তাতে এর অতিরঞ্জন কোথাও নেই। কেননা আমরা জানি যে, কোনো ধারণা গড়ে ওঠে সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার প্রতিবিম্বনে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সরোয়ার জাহানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য,

> মধ্যবিত্ত সমাজমানসের দুটি চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—একটিতে আছে ভীরুতা, নিরাপত্তার প্রত্যাশা, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য-প্রিয়তা, সুবিধাবাদ ইত্যাদি যেটি তার সনাতন রূপ ; অপরটিতে দেখি এই সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তীর্ণ হবার মতো একটা চেতনা। বলা বাহুল্য, প্রায় সব ক্ষেত্রেই অবধারিতভাবে প্রথমটিরই জয় হয়।[৫]

মুক্তিযুদ্ধের সময় মধ্যবিত্তের অনেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে সন্দেহ নেই। তবুও বলা যায় - ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক তথা সর্বশ্রেণীর মানুষের পাশাপাশি আত্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে তাঁরা দেখেছেন অন্বিষ্ট অর্জনের চেতনাভূমি রূপে। আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত' আলোচ্য বিষয়ে সমুজ্জ্বল।

---

২ শওকত ওসমান, *জাহান্নাম হইতে বিদায়,* (দ্বিতীয় সংস্করণ) মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭

৩. শওকত আলী, *যাত্রা,* বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৬

৪. রশীদ হায়দার, *খাঁচায়,* মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫

৫. সারোয়ার জাহান, *বাংলা উপন্যাস : সেকাল একাল,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১ পৃ. ১৯৭-১৯৮

'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসে সমাবেশ ঘটেছে বিচ্ছিন্ন ঘটনারাজির। তবে ঘটনার পর্বে পর্বে চিত্রিত চিত্র এবং চরিত্রগুলো একাকার হয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমকালের স্বরূপ উন্মোচিত করে নিঃসন্দেহ। আর এই স্বরূপে প্রতিভাত হয় শহিদ আনোয়ার পাশার সময়ের দায় ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

সুদীপ্ত শাহিন থেকে শুরু করে মি. মালেক, ড. খালেক, হাসিম শেখ, বীরাঙ্গনা পলি, বীরাঙ্গনা রোশেনা, রাজনৈতিক নেতা ফিরোজ, জামাল সাহেব, চিত্রশিল্পী আবদুল্লাহ মনসুর আমন, সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন হোসেন, কমিউনিস্ট কর্মী বুলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কবি শামসুর রাহমান, বিজন বিহারী, মোনায়েম খান, আইয়ুব খান, টিক্কাখান, এদেশীয় কতিপয় বাঙালিও অবাঙালি দালাল, দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, পাকিস্তান সৈনিক সকলেই উপন্যার্সের ঘটনার পর্বে বিকশিত চরিত্র।

'রাইফেল রোটি আওরাত' আনোয়ার পাশার তৃতীয় উপন্যাস। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন উপন্যাসটির রচনাকাল। আনোয়ার পাশার মৃত্যুর পর ১৯৭৩ সাল প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। আনোয়ার পাশার সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. কাজী আবদুল মান্নানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।[৬]

স্বাধীনতা-উত্তর ড. মান্নান এই উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে প্রকাশের সুযোগ দেন। আনোয়ার পাশা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আল-বদর বাহিনীর হাতে ১৪ ডিসেম্বর অপহৃত ও শহিদ হন। 'শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষ' গ্রন্থের বর্ণনা স্মর্তব্য,

> ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে পোনে ন'টা থেকে ন'টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টারের ৩০ নং বিল্ডিং থেকে ধরে নিয়ে যায়। তখন তাঁর পরনে ছিলো লুঙ্গি, হাওয়াই শার্ট ও গায়ে চাদর। তাঁকে আর পাওয়া যায়নি।[৭]

মাস তিনেক কালের পরিসরের মধ্যে রচিত হলেও, উপন্যাসের সমগ্র বিষয়টি একটি বৃহত্তর ফ্রেমে স্থাপন করা হয়েছে। আর এই ফ্রেমে ধরা আছে আমাদের অস্তিত্বের কথা, ইতিহাসের কথা, বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিচেতনা, ধর্মীয় ও নৈতিক এবং মানবিক মূল্যবোধ, সমাজজীবনাচরণ, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী দ্বারা ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞ, বাংলাদেশব্যাপী গণহত্যা, লুটপাট, পৈশাচিকতা, আগুনে পোড়ানো বাংলাদেশ, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

---

৬. কাজী আবদুল মান্নান, ভূমিকা, *রাইফেল রোটি আওরাত*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৩

৭. *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ*, রশীদ হায়দার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার স্বরূপ, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতি, স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত হওয়া, স্বাধীনতার প্রতি নতুন একটি উপলব্ধির চেতনা, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, নিরাপত্তাহীনতার নির্মম চিত্র, গৃহে ফেরার জাতীয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রচেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশীয় দালাল ও জামাতে ইসলামের ভূমিকা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নানা প্রসঙ্গ।

উপন্যাসের মূল ঘটনা বা কাহিনীর একপক্ষে রায়েছে বাঙালিদের উপর সর্বপ্রকার অমানবিক নির্যাতন পরিচালনাকারী বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী, অপরপক্ষে বাঙালির অস্তিত্ব টিকে রাখার জন্যে স্বদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুখ পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, বাংলাদেশকে পুরোপুরি স্বাধীন দেখতে চাওয়া একজন বীর বাঙালি। ২৫ মার্চের পর থেকেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ইসলামের নাম ভাঙিয়ে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদকে প্রতিষ্ঠার জন্যে সমগ্র বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিদ্বেষকে ছড়িয়ে দেয়।

পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীদের এবং এদেশীয় দালালদের লক্ষ্য ছিল ইয়াহিয়া ও টিক্কা খানের দমননীতি, নির্যাতন, জাতিগত বিদ্বেষ, ইসলামের নাম ভাঙিয়ে পূর্ববাংলার জনগণের উপর অকথ্য নিপীড়ন, যে নিপীড়নের লক্ষ্য ছিল-বাঙালি যেন পাকিস্তানিদের বশ্যতা স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে মাথা উঁচু করে তাদের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে আর কোনোদিন প্রতিবাদমুখর বা লড়াইমুখী না হতে পারে।

বাঙালিদের আদর্শ ছিল—অস্তিত্বরক্ষার আদর্শ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শ, নিজের মতো করে নিজের একটা গৃহের আকাঙ্ক্ষা-যে গৃহটির নাম হবে বাংলাদেশ, স্বাধীন বাংলাদেশ এবং যে বাংলাদেশ আশ্রয় দেবে, নিরাপত্তা দেবে, বাঙালিরে জন্যে এনে দেবে সর্বপ্রকার মুক্তি। শান্তির নীড়সন্ধানী, শেকড়সন্ধানী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে স্বপ্ন দেখেছেন বাঙালিদের সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, বাঙালির হাজার বছরের বীরত্বের আদর্শ।

পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী এবং এদেশীয় দালালরা বাঙালিদের উপর গণহত্যা চালায়, যুদ্ধ শুরু করে তাদের স্বার্থকে রক্ষার জন্যে এবং বাঙালিরা দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাঙালিদের আত্মত্যাগ যুগে যুগেই ছিলো, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও তা সমুজ্জ্বল রয়েছে।

আনোয়ার পাশা প্রগতিশীল এবং সময় সচেতন মানুষ ছিলেন বলেই এতোসব শিল্পীর নিরাসক্ত চেতনায় উঠে এসেছে তাঁর 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাস।

এই উপন্যাসে তিনি সময়ের দায়কে বহন করেছেন। এ দায় ঐতিহাসিক দলিল নির্মাণ করেছে। শওকত ওসমানের 'জাহান্নাম হতে বিদায়' মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রচিত হলেও, 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসটিই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম উপন্যাস হিসেবে গণ্য করা হয়। এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রথম উপন্যাস হিসেবে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে 'মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে' আনোয়ার পাশা বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া উপরের অংশে আলোচিত ঘটনার মর্মলোকের ছবি যেভাবে এঁকেছেন তা যথার্থ কথাশিল্পী বলেই সম্ভব হয়েছে। আবুল ফজল 'রাইফেল রোটি আওরাত' গ্রন্থের পরিচিতি অংশে যথার্থই বলেছেন,

> এ শুধু একাত্তরের বাংলাদেশের হাহাকারের চিত্র নয়, তার দীপ্ত যৌবনেরও এ এক প্রতিচ্ছবি। এ গ্রন্থের নায়ক সুদীপ্ত শাহিন বাংলাদেশে আর বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প প্রত্যয় আর স্বপ্ন কল্পনারই যেন প্রতীক। একাত্তরের মার্চের যে ভয়াবহ ক'টা দিন আর এপ্রিলের প্রথমার্ধের কালো দিনগুলির মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ পরিধিটুকুতেই এ বই-র ঘটনাপ্রবাহ সীমিত, কিন্তু এর আবেদন আর দিগন্ত এ সময়-সীমার আগে ও পরে বহুদূর বিস্তৃত। বাঙালির দুঃখ-বেদনা আর আশা-এষণার এ এমন এক শিল্পরূপ যা সব সময় সীমাকে ডিঙিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী অপরূপ সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে।
>
> উচ্চতর শিল্প-কর্মের জন্য স্থান-কালের দূরত্বের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। আশ্চর্য, আনোয়ার পাশার জন্য তার প্রয়োজন হয়নি। যথার্থ শিল্পী বলেই এ হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ঘটনাকে ছাড়িয়ে পৌঁছতে পেরেছেন ঘটনার মর্মলোকে।

ঘটনার মর্মলোকে উপন্যাসে যেসব চরিত্র উঠে এসেছে তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণকারী বাঙালি এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের চালচিত্রের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে উৎকীর্ণ।

আনোয়ার পাশা এ উপন্যাসের শুরুতে বলেছেন—'রাষ্ট্রের প্রাণ হচ্ছে তার অর্থনীতি, এবং তার চিন্ময় সত্তার অভিব্যক্তি সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে।' মন্তব্যটি পৃথিবীর যে কোনো দেশের জন্যেই খাটে। কিন্তু পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালির আবাসভূমিতে আধিপত্য বিস্তারে ছিলো কৌশলী। তারা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিকশিত হতে দেয়নি। দেয়নি বাঙালির সংস্কৃতিকে বিকশিত হতে। উপরন্তু রাজনৈতিকভাবে যাতে বিকাশগামী হতে না পারে, সেজন্যও রাজনৈতিক বিকাশকেও স্তব্ধ করে রাখার ষড়যন্ত্র অব্যাহত ছিল।

যার পরিণতি লক্ষ্য করি সত্তরের নির্বাচনে তাদের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা ; অতঃপর ২৫ মার্চের রাতে সাঁড়াশি আক্রমণের মধ্য দিয়ে গণহত্যা, লুটপাট, ধ্বংসযজ্ঞ।

একাত্তরের এই হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতন চালানোর জন্যে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি ভূমিকা নেয়া হয়। পাকিস্তানের সেনাপতি জেনারেল টিক্কা খান স্বয়ং আদেশ দেন এবং ফতোয়া জারি করে বলেন যে,

> বাঙালিদের তোমরা হত্যা কর, তাদের দোকানপাট লুট কর, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দাও, তাদের মেয়েদের ধর্ষণ কর।.... জোয়ান ভাইসব, তোমাদের জন্য প্রেসিডেন্ট স্বয়ং গর্ববোধ করেন। তোমরা পাকিস্তানের গৌরব। পাকিস্তান ও ইসলামকে রক্ষার মহান দায়িত্ব তোমাদের উপর। এই যে সব বাঙালিদের দেখছো, এরা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইসলামকে ভুলে গিয়ে সকলে হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। অতএব এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ হবে না, তা হবে পুরোপুরি জেহাদ। (পৃ. ৩১)।

রাইফেল, রোটি ও আওরাত-কেই জীবনের সাথে সম্পর্কিত এই আদর্শকে লালন করে নিয়ে বাংলাদেশের বুকে পা রেখেছে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী। ২৫ মার্চের রাতে এবং তারপর বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈনিকদের যে নির্মমতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ টানা হলো।—

> (ক) জগন্নাথ হলের মাঠে আরো অনেকগুলি বস্তিবাসী বিভিন্ন দিক থেকে মৃতদেহ কুড়িয়ে এনে একত্রে জড়ো করছিল। তাদের পিছে পিছে সঙ্গিন উঁচিয়ে এসেছিল জোয়ানেরা। অতঃপর হুকুম হয়েছিল গর্ত কর। ঝুড়ি কোদাল কোথা থেকে জওয়ানেরাই দিয়েছিল, এবং সে জওয়ানদেরকে খুবই কষ্ট করে কয়েকঘন্টা অনবরত প্রবল গালি ও বুটের লাথি চালাতে হয়েছিল। তবেই না শেষ পর্যন্ত মনমত হয়েছিল গর্তটা। তখনও কাতরাচ্ছে এমন কিছু আহত ব্যক্তিকেও অনেক শবের সঙ্গে সেই গর্তে ফেলে দেওয়ার পর এসেছিল বস্তিবাসীদের পালা। লম্বা গর্তটার পাশে তাদেরকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে ব'লে জওয়ানেরা চাঁদমারি অভ্যাস করেছিল। একটি একটি করে সব ক'টি বস্তিবাসী গর্তে পড়ে গেলে বাকি কাজটুকু করতে হয়েছিল জওয়ানদের। পাশের স্তূপীকৃত মাটি ঠেলে দিয়ে জায়গাটা ভরাট করতে হয়েছিল তাদের। (পৃ. ৩০)।
>
> (খ) জনমানবিহীন রাস্তার দু'পাশে মাঝে মাঝে গুলিবিধ্বস্ত বাড়ি, মানুষের লাশ, পুড়িয়ে দেওয়া জনপদের চিহ্ন।... শ্মশানের মতো উলঙ্গ দেয়াল কোনমতে দাঁড়িয়ে।— এমনি সব দৃশ্যাবলির অপূর্ব মিউজিয়াম সমগ্র ঢাকা

নগরী। (পৃ. ১৬৪)।

(গ) সমস্ত জীবনটাকেই একটা তীব্র বিদ্রূপ বলে সুদীপ্তর মনে হ'ল যখন তিনি জগন্নাথ হলের মাঠে সদ্য পুঁতে দেওয়া নারী-পুরুষের কারো হাতের আঙ্গুল, কারো পায়ের কিয়দংশ মাটি-ফুঁড়ে বেরুনো বৃক্ষ-শিশুর মতো মাথা তুলে থাকতে দেখলেন। (পৃ. ৩১)।

(ঘ) ভূতুড়ে পোড়া বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে মসজিদটা।..... মসজিদের মিনারে মুয়াজ্জিনের প্রাণহীন দেহ। (পৃ. ১৬০)।

পাকিস্তানি সৈন্যরা মানুষ হত্যা এবং ঘরবাড়ি জ্বালানোর পাশাপাশি লুটপাট করেছে, নারী ধর্ষণ করেছে, গম, ছোলা, গুড়োদুধের টিন, চা, চিনি, কেরোসিন, ঘি, সোয়াবিন সহ অনেক দ্রব্যসামগ্রী, জিনিসপত্র লুট করেছে তারা। একদিকে লুট করেছে অন্যদিকে লুটপাটের দৃশ্য ধারণ করেছে—বাঙালিদের বিশ্বের বুকে সন্ত্রাসী ও লুটেরা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যে। পাকিস্তানি সৈনিকদের মূল লক্ষ্যই ছিল তিনটি। 'রোটি খেয়ে গায়ের তাকাত বাড়াও, রাইফেল ধরে প্রতিপক্ষকে খতম কর, তারপর আওরাত নিয়ে ফূর্তি কর।' জীবন সম্পর্কে তাদের যে ধারণা তা পুরোপুরিই বাস্তবায়ন করেছে তারা। লুট করে রোটির অভাব রাখেনি, রাইফেল ধরে প্রতিপক্ষকে খতম করতে এবং আওরাত ধরে নিয়ে গিয়ে ফূর্তি করতে দ্বিধা করেনি। লেখকের ভাষায় বাঙালি মেয়েদের উপর নির্যাতনের একটি উদাহরণ তুলে ধারা হলো।

শহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সামরিক অফিসারদের জন্য একটি গণিকালয় স্থাপন করা হয়েছে। সংবাদটা যে সত্য তার প্রমাণ নাজিম হাতে হাতেই পেয়েছিল। দিনের বেলা দাসীবৃত্তি এবং রাতে গণিকাবৃত্তি এই দুই কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে। সেখানে তাদের শাড়ি পরতে দেয়া হয় না, কেবল সায়া পরে থাকতে হয়। (পৃ. ৭৬)।

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা লালন করার কারণে ও প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ায় পাকিস্তানি সৈনিকরা ড. দেব কিংবা জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা কিংবা মনিরুজ্জামানের মতো প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিমানসের অধিকারীদের নির্মমভাবে হত্যা করতে সামান্যও বিবেক তাড়িত হয়নি। ড. দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও মনিরুজ্জামানের নিহত হবার প্রত্যক্ষদর্শী বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন সাহিত্যিক আহমদ ছফা তাঁর একটি রচনায়,

দু'পা এগুতেই উচ্চৈঃস্বরে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। নার্স হোস্টেলের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার্স থেকে অবিশ্রাম কান্নার শব্দ ভেসে

> আসছে। বাংলা একাডেমীর সহকারী গ্রন্থাগারিক চীৎকার করে বললেন, এই ব্লকে একজনও পুরুষ মানুষ বেঁচে নেই। আমরা ভেতরে গেলাম। দেখি নিহত হয়েছিল পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান। ইংরেজী বিভাগের রিডার ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার ড্রাইভার এসে বললো, ড. ঠাকুরতার কাঁধে গুলি লেগেছে। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি বাসন্তী গুহঠাকুরতাও আহত হয়েছেন। দেখতে গেলাম। ছাত্রেরা হাসপাতালে নিয়ে গেলো তাঁকে। সেখানে বিনা চিকিৎসায় দুদিন পরে এক সহৃদয় প্রাণবন্ত অধ্যাপক মারা যান। ...... শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের খুনে রাঙা কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় দার্শনিক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের বাড়ির গেটে গেলাম। দেখি অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। সব কিছু শুনলাম। কাঁদবার অবস্থাও তখন নয়। এই মানবতাবাদী অধ্যাপক কিভাবে পশুদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন ছাত্রেরা অশ্রুসিক্ত চোখে তা বর্ণনা করলো।[৮]

আনোয়ার পাশা নিজেও ছিলেন প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তবুদ্ধির চেতনা সমৃদ্ধ। ফলে উপন্যাসের ড. খালেক ড. দেবকে যেখানে সব সময় সাম্প্রদায়িক মূল্যে বিবেচনা করেছেন, সেখানে সুদীপ্ত শাহিন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মৃত্যুর পরও ড. দেব হিন্দু এবং পালিত পুত্র মুসলমান হওয়ায় রক্তের মিল খুঁজে পেয়েছেন মানবিক মুল্যবোধে। লেখকের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলো,

> ড. দেব ও তার পুত্রকে একই সারিতে দাঁড়িয়ে দিয়ে ওরা গুলি করে। পাশাপাশি লুটিয়ে পড়ে দুটি দেহ। ওরা পিতাপুত্র। কিন্তু রক্তের মিল ছিল কোথায়? ওদের রক্তের মিল হয়েছে ওদের মৃত্যুর পর। এমনি রক্তের মিল হয়েছিল আরো দু'জনের। দু'জন প্রখ্যাত অধ্যাপক পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান ও ইংরেজী বিভাগের রীডার, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। (পৃ. ২৬)

অবরুদ্ধ ঢাকা নগরী কখনো কেটেছে কার্ফ্যুতে, কখনো বা সামান্য সময়ের জন্যে কার্ফ্যুহীন পরিবেশে। তবে যে সময়টিতে কার্ফ্যু উঠিয়ে নেয়া হতো সে সময়টিতে বাঙালির জনজীবনে কিছুটা স্থিরতা আসলেও, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কাটাতে হতো তাদের। সুকুমার বিশ্বাসের 'বাংলাদেশ : মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল ইতিহাস' গ্রন্থে সত্যেন সেনের বর্ণনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,

---

৮. আহমদ ছফা, ঢাকায় যা দেখেছি যা শুনেছি, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৭৯

> ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় এয়ারফোর্স মেসে গেলাম। মেসের পাশে যে পুকুর তার পূর্বদিক থেকেই নাখালপাড়া এলাকা শুরু। এটা অত্যন্ত গরীব ও নিম্নবিত্ত লোকের এলাকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম পাকবাহিনীর লোকেরা অগ্নিসংযোগকারী যন্ত্র নিয়ে পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলেছে এবং তাদের সাথে মেশিনগানধারী সৈন্যরা পজিশন নিয়েছে।
>
> অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম সারা এলাকায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আতঙ্কগ্রস্ত অসহায় মানুষ প্রাণের ভয়ে আর্তচিৎকার করে বেরিয়ে আসছে বাইরে। সারা শহরে কার্ফু। এরা কার্ফু ভঙ্গ করেছে এই অজুহাতে সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানধারী সৈন্যরা গুলি চালায়।[৯]

এটি ছিল সমগ্র ঢাকা শহরেরই বাস্তব চিত্র। কারণ রাস্তায় বেরোলে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিশ্বাস করা যেতো না। ওদের কাছে নিরাপত্তার আশা করা যেতো না। ফলে চলার পথে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। জীবনরক্ষা ছিল অনিশ্চিত। যে কোনো সময় তারা রাস্তায় যানবাহন আটকিয়ে, সন্দেহভাজন যে কোনো যাত্রীকে, যা পায়ে চলা পথযাত্রীকে ডেকে নিয়ে সনাক্ত করার চেষ্টা করতো বাঙালি কারা? সে মুসলমান কিংবা হিন্দু যে কেউ হোক না কেন? সনাক্ত করার চেষ্টা হতো কারা আওয়ামী লীগার, কারা হিন্দু, কারা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী?

সুদীপ্ত শাহিন, ফিরোজ তাঁরাও টহলধারী মেলিটারিদের হাতে এ রকমের নির্যাতনের শিকার হয়েও ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়েছেন, পেয়েছেন বুদ্ধির জোরে। রক্ষা পেয়েছে বারবার ধরা পড়ার পরও বিজন বিহারীর মত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র। অবশ্য অনেকের ভাগ্যে তা জুটেনি। জুটেছে সারিবদ্ধভাবে নির্মম ও অসহায়ভাবে মৃত্যু।

পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর নির্মম আচরণের পাশাপাশি এদেশীয় দালালদের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও, মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাৎপটে চব্বিশ বছরের গ্লানিমাখা সময়টিতেও এদেশীয় দালাল বুদ্ধিজীবীরা যে কেমন স্বার্থন্বেষী চরিত্রের ছিলো তা মি. মালেক চরিত্রের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত। সুদীপ্ত শাহিন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী লোকদের সনাক্ত করতে পেরেছিলেন, তাঁর মধ্যে প্রগতিশীল চারিত্রিক গুণাবলি ধারণ

---

৯. সত্যেন সেন, 'নাদির গুণ্ডা', *কালান্তর*, শারদীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর '৭১, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাসের *বাংলাদেশ : মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী,, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬

করায়। তাই মি. মালেককেও চিনতে ভুল করেনানি তিনি।

দালাল শিক্ষকদের চরিত্রের অন্যতম চরিত্র মি. মালেক। মানবিক গুণাবলির লেশমাত্র ছিলো না তাঁর মধ্যে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাককালে মি. মালেক মাসিক মোহাম্মদীতে কমিউনিস্টদের গালি দিয়ে কবিতা লিখতেন। কারণ একটাই—দেশ স্বাধীন হলে, দেশ হয়তো মুসলিম লীগ অথবা কংগ্রেসের হাতে থাকবে। আর কমিউনিস্টদের গালি দিয়ে কবিতা লিখলে মুসলিম লীগ অথবা কংগ্রেসের স্নেহভাজন হওয়া যাবে। সেও তাঁর স্বার্থ উদ্ধারে সহজেই নামতে পারবে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পাবার পর, মুসলিম লীগ সরকারের আনুকূল্য পাবার আশায় তিনি পূর্ববাংলার বাঙালিকেও পাকিস্তানি জাতি বানানোর প্রকল্প হাতে নেন।

মি. মালেক পাকিস্তান সরকারের দালালি করায় পুরস্কার স্বরূপ তিনি লাভ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে চাকরি। এবং তিন বছরের মধ্যে রিডার পদে পদোন্নতি। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হলে, আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলাতে গিয়ে তিনি পূর্ববাংলা বিষয়ক কবিতা লিখে ফেলেন। অবশ্য ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করলে তিনি পুনরায় তাঁর চেহারার রূপ পাল্টিয়ে আবার পাকিস্তানপন্থী হয়ে আইয়ুবশাহীর গুণকীর্তনে মেতে ওঠেন। আইয়ুব শাহীর পরামর্শে তিনি রবীন্দ্রচর্চা বর্জনের ডাক দেন। পাকিস্তানি সাহিত্যের আদর্শকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন পুঁথি সাহিত্যের আদলে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা কিছুটা প্রতিষ্ঠা পাবার পর আইয়ুব খান সামরিক ক্ষমতা বলে পাকিস্তান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি যাতে না আসতে পারে সেজন্য কৌশলে উর্দু চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। মি. মালেক নিজেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

> হুজুর, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে কিছু চালাকির আশ্রয় নিতে হবে। প্রথমেই উর্দুর কথা বললে দেশে হট্টগোল হে-চৈ শুরু হয়ে যাবে।....
>
> হুজুর সে জন্যই বলছিলাম—প্রথমেই ওদেরকে বাংলা ভাষা ভুলিয়ে দিতে হবে। তারপর একটু একটু করে দিতে হবে উর্দু। (পৃ. ১৫)

মি. মালেক হয়তো তাঁর চরিত্রের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। কিংবা স্বার্থের মোহে তাঁর নিয়তি সম্পর্কে কখনো ভাবনা চিন্তাও আসেনি তাঁর বিবেকে। যে মালেকের চরিত্র ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে পাকিস্তানিদের দালালরূপে, পরিণতি পেয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতেই ২৫ মার্চের সাঁড়াশি আক্রমণে নিহত হয়ে। মালেকের সাথে তার পাঁচ বছরের একটি ছেলেও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মারা গিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে পর্যন্ত মিলিটারিরা তাদের নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়নি। ক্যান্টনমেন্টে উঠিয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর তিন দিন তাদের কাছে রাখার পর ফেরত পাঠায় মি. মালেকের ছোট ভাই ড. খালেকের হাতে।

মুক্তিযুদ্ধের আগে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে এদেশীয় দালালদের যেমন অভাব ছিলো না, তেমনি অভাব ছিলো না মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়েও। মিঃ মালেকের ছোটভাই ড. খালেক এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ড. খালেক হচ্ছে মালেকের বর্ধিত সংস্করণ। ড. খালেক মনে করতেন –

> যে কোনো দেশের সৈনিকদের তুলনায় আমাদের পাকিস্তানী সেন্যদের নীতিবোধ অনেক উন্নত। (পৃ. ১৯)
>
> এছাড়াও ড. খালেকের বিশ্বাস ছিলো যে, পাকিস্তানের মুসলমানদের ইমানের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি, আর তা হলো—
>
> "আল্লাহ, আল্লাহ্র রসুল, কায়েদে আযম, পাকিস্তান আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী"। (পৃ. ২২)

খালেক–এর মন্তব্য অনুযায়ী বলা যায় – 'পাকিস্তান মানেই ইসলাম, ইসলাম মানেই পাকিস্তান।' তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনার ঐক্যে পচন ধরানোর জন্যে দেশের সব শহিদ মিনার ভাঙতে চেয়েছেন। শহিদ মিনার ভেঙে নির্মাণ করতে প্রয়াসী সেইস্থানে মসজিদ। মি. মালেক ও ড. খালেক দুই ভাইই অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক ছিলেন। আর তা কেবল নিজের সার্থ হাসিলের জনেই। তা না হলে– মি. মালেকের স্ত্রী ও দুই কন্যাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফেরত পাঠানোর পরও ড. খালেক পাকিস্তানি সৈন্যদের ঘৃণা করতে পারেন নি। বরঞ্চ তিনি সুদীপ্ত শাহিনের সামনে উচ্চারণ করেছেন—

> আর্মির জেনারসিটি দেখুন, মেয়েদের ফেরত পাঠাবার সময় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য তিনশো টাকা দিয়েছে। দে আর কোয়ইট্ সেন্সিবল্ ফেলো। (পৃ. ২০)

ড. খালেক পাকিস্তানবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে। অথচ ড. দেব ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক, দার্শনিক এবং অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। ড. দেবের কাছে ধর্ম কখনো বড় ছিলো না, বড় ছিলো মানুষ। ফলে ড. দেব মহানবী (সাঃ)–এর জন্মদিন উপলক্ষে মসজিদে আলোচনা অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। সুদীপ্ত শাহিন, ড. দেবকে মসজিদে একজন মহামানবের জীবনী শুনতে এসেছেন দেখে খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু ড. খালেক খুশি হতে পারেননি। বরং তিনি সুদীপ্ত শাহিনের কাছে অভিযোগ করে

উচ্চারণ করেছেন—

> মালাউনের কাণ্ডটা দেখলেন, কেমন করে মসজিদের ইজ্জত নষ্ট করে দিলে। (পৃ. ২৫১)

ড. দেব নিঃসন্তান হবার ফলে তিনি একটি মুসলমান ছেলেকে পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়টিকেও ড. খালেক স্বাভাবিক চোখে দেখতে পারতেন না। ড. খালেক মনে করতেন মুসলমান ছেলেকে পালিত পুত্র হিসেবে রেখে দার্শনিকতার ভণ্ডামির পরিচয় দিচ্ছেন। এর কারণ হিসেবে দেখা গেছে ড. খালেক মনে করতেন,—

> হিন্দু বা মুসলমানের ভেদাভেদটাই যদি না থাকল তাহলে পাকিস্তান ও হিন্দুদের ভেদাভেদটাই বা থাকল কোনখানে। (পৃ. ২৬)

ড. খালেকের কাছে পাকিস্তান ছিলো একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। তাই সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি লালন করতেন মনে-প্রাণে। দালালি করতে এজন্যে তাঁর কোনো দ্বন্দ্ব ক্রিয়া করতো না তার মনে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর যেমন দালালি করেছে এদেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী, তেমনি মুনায়েম খান, নূরুল আমিনদের মতো দেশীয় রাজনৈতিক নেতারাও দালালি করেছে। মুনায়েম খানরা মূলত. নিজেদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্যে দালালি করেছে। দালালি করতে গিয়ে মোনায়েম খানরা উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে সারা বাংলাদেশে। সে সময় রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জনের প্রচেষ্টা উগ্র সাম্প্রদায়িকতারই নামান্তর। রবীন্দ্র-সাহিত্য বর্জনের ডাক দিয়েও যখন তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না—তখন এই মোনায়েম খানই গভর্নর থাকাকালে প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাইকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত রচনার ফরমায়েশ দিয়েছিলেন। মোনায়েম খানের আরও একটি উগ্র সাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ দেয়া হল। মোনায়েম খান যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, তখন তাঁকে কেউ আচার্য বললে তিনি চটতেন এই বলে যে,—

> আমারে কি তোমরা হিন্দু ঠাওরাতেছ? মুসলমানের আচার্য কওয়া বড়োই দুষের (দোষের) কথা। কুটি কুটি (কোটি কোটি) টাকা করচ কইর‍্যা তোমাদেরে আচ্ছা কইর‍্যা শিক্ষা দিবার লাইগা এই যে বিল্ডিং বানাইয়া দিছি তা কি এমনি কাফের হওন লাইগা? কেন, আমাকে তোমরা চ্যান্সেলর কইতে পার না।" (পৃ. ১৩৩)

ড. খালেক বা মালেকের মতো পাকিস্তানিদের পক্ষে জামায়াত শিবিরের এবং এদেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল দালালরা স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্বে ও পরেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের আগে পাকিস্তান বিরোধী এক ছাত্রসভায় জামাতের যে

ভূমিকা ছিলো, তা লেখকের মন্তব্য থেকে উদ্ধৃতি টানা হলো,—

> জামাতে ইসলামের একদল ছাত্র অন্য একটি ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত একটি সভা পণ্ড করতে গিয়ে মারামারি বাধিয়েছিল। (পৃ. ২২)

১৯৭০-এর নির্বাচনের জামায়াত শিবির আওয়ামী লীগ তথা বাঙালিদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছে। এই ধরনের ভূমিকার কথা আমরা আওয়ামী লীগ সমর্থক ফিরোজের চাচা জামায়াত কর্মীর কাছ থেকে পাই।

২৫ মার্চে রাজার বাগ পুলিশ লাইন থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের কামানের মুখে তাঁরা বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ফলে অনেকে পালিয়েছেন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। পলায়নরত জনৈক তিনজন পুলিশ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ফিরোজের চাচার (জামায়াত সমর্থক) বাড়ি। কিন্তু ফিরোজের চাচা তাঁদেরকে আশ্রয় দেবার পরও কার্ফ্যু উঠে গেলে নিজে আর্মিদের খবর দিয়ে আনিয়ে মুক্তিযোদ্ধা তিন পুলিশকে ধরিয়ে দেয়।

হাসিম সেখ-এর উক্তি থেকেও জামায়াত শিবিরের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কার্যক্রমের কথা জানা যায় –

> জমাতে ইসলাম ও মুসলিম লীগের সাথে সেনাবাহিনীর শলাপরামর্শ চলছে শুনলাম। এটাকে ওরা দ্বিতীয় ইন্দোনেশিয়া বানাতে চায়।.... চার শ্রেণীর মানুষ ওরা দেশ থেকে নির্মূল করবে – বুদ্ধিজীবী, আওয়ামী লীগার, কমিউনিস্ট ও হিন্দু। পৃ. (৪০)

মুক্তিযুদ্ধের সময়েও বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ফতোয়াবাজির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। আর এ ধরনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সোবহান মৌলভির চরিত্রে। নিম্নে উদ্ধৃতাংশে সোবহান মৌলভির ফতোয়াবাজির চিত্র বিধৃত—

> করিমন বিবি, তুমি ছাওয়ালের লগে আর দুকখু কইরো না। তা হ'লে ছওয়াব পাইবা। জেহাদের কামে....ছওয়াব আছে তা জানিস। এক একবারের কামে এক একটা কাফের কতলের ছওয়াব হয়। (পৃ. ৮৮)

আনোয়ার পাশার এ উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও, এ উপন্যাসে বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রসঙ্গটিও এসেছে। এসেছে আইয়ুব খানের প্রথম মার্শাল ল জারি এবং ক্ষমতা থেকে বিদায়ের এবং আসাদ ও শামসুজ্জোহার শহিদ হবার ঘটনাও। বাঙালি '৫২-র ভাষা আন্দোলনে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রকাশ করে তার চিন্ময় সত্তার অভিব্যক্তি। এ আন্দোলনে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও দ্বিধা করেননি তাঁরা। শহিদ হন সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত, শফিক প্রমুখ।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হন আসাদ, সামসুজ্জোহা। এতোসব শহিদ হবার পেছনে বাঙালির ন্যায্য দাবি আদায়ের অন্বিষ্টকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একাত্তরের এ অন্বিষ্ট পরিণতি পায় পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলায়।

বাঙালি মেয়েরা ধর্ষিতা হলেও তারা যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তা বীরাঙ্গনা পলি, বীরাঙ্গনা রোশেনা, কিংবা অজ্ঞাতনামা ধর্ষিতা মেয়েটি–এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। অজ্ঞাতনামা ধর্ষিতা মেয়েটির দাঁতে মিলিটাররি গায়ের কাঁচা মাংস দেখতে পেয়েছিলেন সুদীপ্ত। বীরাঙ্গনা পলিকে শহরে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মতো ধরে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে রেখেছিল। বন্দিনী পলি একজন সামরিক অফিসারের সাথে প্রেমের অভিনয় করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে অন্যত্র আশ্রয় নেয় প্রতিশোধস্পৃহায়। যে বাড়িতে পলি ও সামরিক অফিসার ওঠে তা হানাদার বাহিনী দ্বারা তছনছ হওয়া পরিত্যক্ত বাড়ি। এই বাড়িতে সামরিক অফিসারটি একসময় অতিরিক্ত মদ পান করে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আর সেই সুযোগ গ্রহণ করে পলি। পলি বটি দিয়ে সামরিক অফিসারটিকে হত্যা করে। এতেই সে ক্ষান্ত হয়নি। সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন হোসেনের কাছ থেকে সংগ্রহ করা মাইন বুকে বেঁধে সে মিলিটারি ভর্তি ট্রাকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হত্যা করেছিল বিশ পঁচিশটি পাকিস্তানি শত্রুসেনা। পলি উপন্যাসের আরেকটি প্রতিবাদী উজ্জ্বল চরিত্র চিত্রশিল্পী আমনের স্ত্রী।

পলির মতোই আরেক বীরাঙ্গনা রোশেনা। সে ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সেও বাঙালি হত্যা ও নারী নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে শরীরে মাইন বেধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রুসেনার ট্রাকের নিচে।

আমন স্বার্থান্বেষী মালেক কিংবা খালেকের মতো দালাল না হয়ে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালে। পশ্চিম পাকিস্তান কিভাবে বাংলাদেশকে শোষণ করে যাচ্ছিল, সে কাহিনীকে ছবিতে এঁকে বিপুল সাড়া জাগিয়ে ছিলেন। আবহমান বাংলার সংস্কৃতির সাথে বঙ্গজননীর প্রভাব অনস্বীকার্য। এই বঙ্গজননীর চিত্রও তাঁর রঙের তুলিতে নতুন মাত্রায় অভিসিক্ত হয়েছিল। আর ২৫ মার্চের পর হাহাকারের ঢাকাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বাঙালির আত্মমর্যাদা কিসে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে তা বোধোদয় ঘটায়, তিনি বুক ভরে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন 'সব কথার শেষ কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা'। এই আর্তি প্রতিটি জাগ্রত বাঙালির ছিলো। ২৫ মার্চের পর আমন তার স্ত্রী পলি ও এক ছেলে, এক মেয়ে অর্থাৎ দুই সন্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কিছুটা উদ্ভ্রান্তের মতো আচরণে মেতে ওঠেন। কিন্তু আমনকে উদ্‌ভ্রান্ত না বলে প্রতিবাদী বাঙালি জাতির

একটি প্রতীকী চরিত্র বললে অতিরিক্ত কিছু বলা হবে না। যার ফলে তাঁর স্ত্রীসহ সন্তানের হারানোর বেদনায় তিনি শোকাহত ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেও পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সচেতন মানসেই। শহিদ আনোয়ার পাশা, আমনের প্রতিবাদ ও সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে যে মূল্যায়ন রেখা টেনেছেন তা স্মর্তব্য -

> আমার ছেলে-মেয়েদের গুলি করেছ, আমিও তোমাদের গুলি করব, আমার ছেলেমেয়েরা গুলি খেয়েছে, আমিও গুলি খাব, আমাকে তোমরা গুলি কর, এসব কথা কি পাগলের কথা ! (পৃ. ৭১)

আমন এসব কথা বলার পাশাপাশি প্রতিবাদকে প্রতিরোধের আদল দিলেন আধখানা ইট হাতে নিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর দিকে ছুঁড়ে মারার সাহস সঞ্চয় করায়। সে ইট যে ছুঁড়ে মারতো এতে সংশয় থাকার কথা নয়। ইট সে ছুড়তে পারেনি, কারণ ইট ছুড়ার আগেই সৈনিকদের গুলি তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। আমনের প্রতিবাদী এবং প্রতিরোধ গড়ার চেতনা বাঙালির মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। সুদীপ্ত এই দৃশ্য দেখে তাই তো উচ্চারণ করে উঠেছিলেন,— "সেই ইটের টুকরা হয়ে উঠেছিল কামানের গোলা।'

এই উপন্যাসের সুদীপ্ত শাহিনকে নায়ক চরিত্র না বলে প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায়। সুদীপ্ত শাহিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইংরেজির অধ্যাপক। সুদীপ্ত কেন্দ্রয়ী চরিত্র নিঃসন্দেহে। তবে নায়কোচিত চারিত্রিক গুণাবলিও তাঁর মাঝে বিদ্যমান। কেননা এই উপন্যাসে 'সময়'-ই হচ্ছে নায়কী আর সময়ের পরিবেশ, চেতনার সাথে সুদীপ্ত চরিত্রটি নিবিড় ভাবে ঘনিষ্ট। সুদীপ্ত শাহিন উপন্যাসের কাহিনীতে যেভাবে উপস্থাপিত তা থেকে বোঝা যায়—তিনি স্বদেশের বুকে থেকেও আশ্রয়হীন। গৃহহীন। আশ্রয়ের খোঁজে তাঁকে কামনা করতে হয়েছে 'নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং একটি প্রভাতের।' মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী চক্র এবং স্বদেশপ্রেমীদের সনাক্ত করতে ভুল করেননি সুদীপ্ত শাহিন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী চক্র ও স্বদেশপ্রেমীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুদীপ্ত বাঙালির চেতনায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষার জাগ্রত রূপটিকে প্রস্ফুটিত হতে দেখেছেন। শুধু মুক্তিযুদ্ধেই নয়, মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মার্চের উত্তাল ও উত্তাপপূর্ণ সময়েও মুক্তিকামী বাঙালির জেগে ওঠা রূপটি দীপ্তিময় হতে দেখেছেন। অপরাপর স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবীদের মতো সুদীপ্ত শাহিনের চরিত্রে ছিলো না দালালিপনা। ফলে সুদীপ্ত যখন ভারতে ছিলেন তখন ভারতে স্থায়ী আশ্রয় লাভ করতে পারেননি মুসলমান বলে। আর পাকিস্তানে স্থায়ী আশ্রয় পাননি বাঙালি বলে।

সুদীপ্ত শাহিনের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবোধ ছিল প্রখর। আর এ কারণে বাঙালির মুক্তির আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন। সুদীপ্ত শাহিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম উপাদান হলো – বাঁচার জন্যে আকাঙ্ক্ষা। বিচিত্রভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণা খুঁজেছেন তিনি বিভিন্নভাবে। সুদীপ্ত শাহিনের মতোই বীর বাঙালিরা, মুক্তিকামী বাঙালিরা, প্রগতিশীল বাঙালিরা বাঁচার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। অবশ্য এর মানে এ নয় যে, সমঝোতা করে বা দালালি করে বাঁচার প্রেরণা খুঁজেছেন। তাদের বাঁচার মধ্যে স্বাধীনতারস্পৃহা প্রবল। মুক্তির ঘ্রাণে বেঁচে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় বারবার ঘোষিত এ উপন্যাসে, যা সময়ের দিক থেকে দায়বদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাস্নাত। সুদীপ্ত শাহিনের চরিত্রে মধ্যবিত্তের দোলাচলতা যে ছিলো না এমন নয়। তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে পালিয়ে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন স্থানে। তবে তাঁর মধ্যে পলায়নপরতার যে মনোভাব অমরা লক্ষ্য করি তা কেবল মধ্যবিত্তের দোলাচল বৃত্তিকে প্রতিষ্ঠা করে না, বাঁচার প্রেরণাকে মর্যাদা দান করে। কারণ তিনি মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়েও বাংলাদেশকে চিত্রিত করার যে প্রয়াস চালিয়েছেন, তা থেকে তাঁকে মুক্তিযোদ্ধা বললেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি কলম সৈনিকের কাজ করেছেন। তিনি অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে বাস করেও কার্ফ্যুর ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়িয়েছেন শহিদ মিনার এলাকায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে ; খোঁজ নিয়েছেন পরিচিত জনদের। স্বদেশের বুকের তাণ্ডবলীলাকে বিশ্বের বুকে প্রচারের অভিব্যক্তিও তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হয়। ফলে ফিরোজের সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে উঠে এসেছে সে, অভিব্যক্তি—

> এখনি বিশ্বের সর্বত্র আমাদের লোক ছড়িয়ে পড়া দরকার। এই বিংশ শতাব্দীতেও আসুরিক শক্তির কাছে সভ্যতাকে মৃত্যু বরণ করতে হচ্ছে এ সংবাদ তাদের জানা দরকার। (পৃ. ১৩১)

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যখন নিজেদের সনাক্ত করণের অভিপ্রায় ও দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়েছে, তখনও আমরা শুনেছি—

> পঁচিশে মার্চ থেকে আমরা আর পাকিস্তানি নই। অতএব এখন আমাদের এই স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের বুক থেকে পাকিস্তানিদের নিশ্চিহ্ন করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। (পৃ. ১৩১)

এ তো সুদীপ্ত শাহিনেরই প্রতিধ্বনি এবং সুদীপ্ত শাহিন যেন বাংলাদেশের প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি। তাঁর বেঁচে থাকার মাঝে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দুর্বার গতি পেয়েছিল তারও উদাহরণ আমরা লক্ষ্য করি এ উপন্যাসে।

সুদীপ্ত শাহিন পশ্চিম পাকিস্তানের রেডিওতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কণ্ঠে শুনেছিলেন - শেখ মুজিবকে দেশের শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক বলে গালি দিতে। সুদীপ্ত এই গালিকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর অভিব্যক্তি হলো - শেখ মুজিবের পেছনে যেখানে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমর্থন রয়েছে, সেখানে তাঁকে দেশের শত্রু বলা সমীচীন হচ্ছে না। পাকিস্তান সরকারের পেছনে পূর্ব বাংলার মানুষের সমর্থন নেই। সমর্থন রয়েছে বন্দুক আর গোলাবারুদের। এ প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন 'মানুষের চেয়ে বন্দুকের ক্ষমতা কখনো বেশি হতে পারে না।' মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে মধ্যবিত্তসহ সর্বশ্রেণীর বাঙালির প্রাণে, সে মূর্তিমান রূপটিও সুদীপ্ত শাহিনের মাঝে জাগ্রত ছিল। সুদীপ্ত শাহিনের উক্তি এবং মন্তব্য এ ক্ষেত্রে স্মতর্ব্য—

> বঙ্গবন্ধু তো বলেই দিয়েছেন 'রক্ত যখন দিয়েছি প্রয়োজন হ'লে আরো রক্ত দেব। দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্।' বঙ্গবন্ধুর সেই সাতই মার্চের কণ্ঠস্বর। একবার তা যে বাঙালির কানে গেছে জীবনের মতো সে হয়ে গেছে অন্য মানুষ।.... সাতই মার্চের রেসকোর্স মাঠে এখন ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। অতীতের কোন আনন্দক্ষণে আত্মনিমজ্জনের মধ্যে বেঁচে ওঠার কোন রসদ যদি মেলে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশকে জপমন্ত্রের মতো সারাক্ষণ মনের মধ্যে - জাগ্রত রেখে কর্মের পথ বেছে নিতে হবে..... 'আর যদি আমার মানুষের উপর একটি গুলি চলে, তোমাদের উপর নির্দেশ রইল, ঘরে ঘরে দুর্গ গ'ড়ে তোলো।.... আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের ঘরকে এক-একটি দুর্গ ক'রে তুলতে পারতাম। মুজিব ভাই, তোমার বাংলাদেশ একদিন ওদের জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ হবেই। (পৃ. ১২০)

সুদীপ্ত শাহিন কোরায়শী সাহেবের মতোই সাহসী ও বিপ্লবী মানসে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করে, কিভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, অর্থাৎ স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায় তা ভেবেছেন। কোরায়শী সাহেব সুদীপ্ত ও ফিরোজের সাথে কথোপকথনের সময় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা যেভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, তা যেন সুদীপ্ত শাহিন সহ প্রতিটি বাঙালিরই মনের কথা ছিলো। কোরায়শী সাহেব বলেছিলেন -

> বাংলার যে-কোন খানিকটা অঞ্চলকে মুক্ত ক'রে রেখে সেইখানে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার করতে হবে এবং ধীরে ধীরে সারা বাংলাকে মুক্ত করতে হবে। (পৃ. ১২৬)

আর এ বক্তব্য শোনার পরপরই সুদীপ্ত শাহিনের মনে হয়েছিলো,—

> তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার-স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা-এসব কি বলছেন কোরায়শী সাহেব। এসব তো তাঁর নিজের মনের কথা। বোধ হয় শুধু তাঁরই নয় প্রত্যেকটি বাঙালির মনের কথা। যে মন স্বপ্ন দেখে সেই মনের কথা। এবং একদিন যে তা সত্য হবে তাতেও সন্দেহ নেই। (পৃ. ১২৬)

অবশ্য এসব ভেবেও তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মনে দোলাচলতার সৃষ্টি হয়েছিল সত্য। কিন্তু তাঁর ভাবনাকে আবার শাণিত করতে পেরেছেন তিনি। যেমন—

> সেই শিল্পী-সাহিত্যিকদের মিছিল। রাইটার্স গিল্ড থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত শোভাযাত্রা। কিংবা ঢাকা শহরের সকল শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের সেই মিলিত শোভাযাত্রা—বায়তুল মোকাররম থেকে শহীদ মিনার। সেখানে তোমরা শ্লোগান কি দিয়েছিলে, মনে আছে? মনে আছে। পাক-বাহিনী খতম কর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর। বাংলাদেশ স্বাধীন কর—বীর বাঙালি অস্ত্র ধর। সেই স্বাধীনতার কথাই তো এখন বলছেন কোরায়শী সাহেব। অস্ত্রবলে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার কথা বলছেন।

ফিরোজ এবং জামাল সাহেব তাঁরা রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি। তাঁরা দেশের ভিতরে থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছেন, পাকিস্তানি সৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে। অনেককে আশ্রয় দিয়েছেন। সুদীপ্ত শাহিন তো প্রথমে তার বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার ছেড়ে ফিরোজের বাসাতেই উঠেছিলেন। ফিরোজের বাসাতেও নিরাপদ মনে না করে অবশেষে আশ্রয় নিয়েছিলেন বুলার বাসায়। যেখানে পরিচয় হয়েছিল জামাল সাহেবের। বুলা বাইরে থেকে একজন জামাতকর্মী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শ ছিলো তার কমিউনিস্ট পার্টি। বুলা স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি। ফিরোজ কিংবা জামাল সাহেব কিংবা বুলারা তখন মরতে প্রস্তুত। মারতে প্রস্তুত। এ প্রত্যয়টিও মুক্তিকামী সকল বাঙালির। এ প্রত্যয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও উচ্চারিত হয়েছে। ফলে আনোয়ার পাশা যথার্থই উপলব্ধি করে উচ্চারণ করেছেন—

> ভালোবাসাই বাঙালিকে পথ দেখাবে। বাঙালির অস্ত্রের শক্তি আজ সীমিত হতে পারে, কিন্তু ভালোবাসার সম্পদ তো অফুরন্ত। সেই প্রীতি ভালোবাসার সঙ্গে এবার অস্ত্রের সম্মেলন হয়েছে—এবার বাঙালি দুর্জয়।.... নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত সে আর কতদূরে। বেশি দূরে হতে পারে না। মাত্র এই রাত টুকু তো। মা ভৈঃ কেটে যাবে। (পৃ. ১৮০)

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, শেখ মুজিবের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফসল। এছাড়া ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চে রাতে পাকহানাদার বাহিনীর হাতে ধরা দেয়া এসব কিছুই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। শেখ মুজিবের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পাই-গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই মানবিক মূল্যবোধকে মর্যাদা দিয়েছেন। আর এ কারণেই তিনি যুক্তিকে বিবেক দিয়ে বিবেচনা করার প্রয়াসী হয়েছেন। কেননা তিনি মানতেন যে, যুক্তির কথা তিনিই মানবেন যিনি বিবেকবান। উপন্যাসে বিধৃত শেখ মুজিবুর রহমানের উক্তি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য—

> কেউ যদি যুক্তির কথা বলেন এবং তিনি যদি সংখ্যায় একজনও হন, আমরা তাঁর কথা মানব। এই তো বিবেকবান সভ্য মানুষের কথা। অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী, অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তিনি। ফলে ২৫ মার্চে রাতে শেখ মুজিবকে নিয়ে ভেবেছেন ফিরোজের মতো বঙ্গবাসীরা।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের হাসিম সেখ নামের ত্যাগী দেশপ্রেমী পুলিশটির চরিত্রও উল্লেখযোগ্য। পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় কামানের মুখে টিকতে না পেরে পালিয়ে এসেছিল। তার পালানোর মধ্যেও রয়েছে অর্থবহতা। তার অভিব্যক্তি হলো—

> ম'রে লাভ কি? তখনই মরব যখন ওদের কাউকে মারার ক্ষমতা হাতে থাকবে। ওই শালাদের মতো কামান চালাতে শিখে তখন সামনে আসবো এবং দেখব, শালাদের যুদ্ধের কত সখ। (পৃ. ৪৩)

কিংবা

> কেন আমাদের মা-বোনের সর্বনাশ করবে ওরা? খোদার কসম আমার মায়ের কসম, আমাদের রক্তের কসম, এর প্রতিশোধ নেব। (পৃ. ৭২)

এদেশের অগণিত মানুষ, দেশপ্রেমিক নাগরিক-গৃহহারা এবং নিরাশ্রয়ী অনেক বাঙালিকে আশ্রয় দিয়ে সহযোগিতা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করেছে। এক বাঙালি আরেক বাঙালিকে কাছে টেনে নিয়েছে পরিচিত জনের মতো। এই ধরনের চরিত্র ও চিত্রের পরিচয়ও এই উপন্যাসে নানাভাবে উঠে এসেছে। মধুদা, হাসিম সেখকে আশ্রয় দেয়া মহিলাটি, ফিরোজ, বুলা—এই ধরনের অসংখ্য ব্যক্তি বা মানুষ রয়েছেন, যাঁরা যুক্তিকামী বাঙালিদের বিভিন্নভাবে আশ্রয় দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। মধুদা এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল চরিত্র। মধুদা একাত্তরের ২৫ মার্চ নিজেই পরিবারসহ

ছিলেন অসহায়। অথচ মধুদা মুক্তিযু, পূর্বকালে পাকিস্তান বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের তিনি ছায়া দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। মধুদার অভিব্যক্তি ছিলো– 'তোমরা দেশকে বাঁচাবে, আর আমি তোমাদের বাঁচাব না?' মধুদা পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের সহযোগিতা করতেন বলে তাঁকেও নির্মমভাবে শহিদ হতে হয় পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে। আর এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে এদেশীয় দালালরা।

উপন্যাসে একটি দুটি রেখায় যে চরিত্রগুলো আঁকা হয়েছে তা গভীরভাবে দাগ কাটে আমাদের মনে। চিত্রিত চরিত্রগুলোও জীবনঘনিষ্ট।

আনোয়ার পাশা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মর্মমূলে লালন করেছেন। আর এই চেতনাকে সময়ের দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে বিকশিত করেছেন। সময়ের এই দায়বদ্ধতা সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় দায়বদ্ধতারই পরিচায়ক।